সমকাল

তারিখ - 4 JUN 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 9

শিক্ষার্থী, শিক্ষক আস্থার সংকট

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
মওদুদ আহম্মেদ সুজন
সভাপতি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি

সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ছয় ঘণ্টব্যাপী সড়ক অবরোধ। শেষ পর্যন্ত ৪৩ শিক্ষার্থীকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া ও অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ। উপাচার্য কর্তৃক দাবিনামায় স্বাক্ষরের পরও শিক্ষার্থীদের রাস্তা না ছাড়া, তৎক্ষণাৎ রাস্তায় গতিনিরোধক ও ওভারব্রিজ স্থাপন এবং ক্ষতিপূরণের দাবি পূরণের অবাস্তব দাবি– এসব প্রশ্ন সামনে এসেছে। উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম তিন তিনবার অবরোধরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার পরও কেন শিক্ষার্থীদের আস্থায় নিতে পারলেন না? অন্যদিকে, এ প্রশ্নও রয়েছে– নিহত শিক্ষার্থীদের জানাজা ক্যাম্পাসে কেন করতে দেওয়া হলো না? উপাচার্য নিজেই বলেছেন, তিনি এ বিষয়ে জানতেন না। ভেতরের রাজনীতির মারপ্যাঁচের কথায় যাওয়ার আগে শিক্ষার্থীরা কেন শিক্ষকদের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না, সে বিষয়ে আসা যাক।

২০১৩ সালের শেষ থেকে ২০১৪ সালের প্রথম দিককার কথা। তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্তে আন্দোলনের অংশ হিসেবে টানা তিন মাস ক্লাস বর্জন করেন শিক্ষকরা। শিক্ষক সমিতির তৎকালীন সভাপতি অধ্যাপক অজিত কুমার মজুমদারসহ অন্যান্য শিক্ষক নেতা বক্তৃতা-বিবৃতিতে 'এই ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়া হবে' বলে শিক্ষার্থীদের পাশে পাওয়ার চেষ্টা করেন। প্রয়োজনে ছুটির দিনেও ক্লাস নেওয়া হবে বলা হয়েছিল। কিন্তু কেউ কথা রাখেনি। সেই ক্ষতি পুষিয়ে তো দেওয়া হয়ইনি, বরং শিক্ষক সমিতির আনুষ্ঠানিক দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গত বছর সাপ্তাহিক ছুটি একদিন থেকে দু'দিনে উন্নীত করে। বলা হয়েছিল, এখন সকাল ৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ক্লাস হবে; প্রয়োজনে দুপুর ১টায় শিক্ষক বাস বন্ধ করে দেওয়া হবে– যাতে শিক্ষকরা আগেই চলে না যান। কিন্তু কেউ কথা রাখেননি। দুপুর সাড়ে ১২টার পর অধিকাংশ অনুষদেই শিক্ষকদের আর পাওয়া যায় না। রুটিন মেনে খুব কম শিক্ষকই ক্লাস নেন। আরও লক্ষণীয় যে, দশটার আগে অধিকাংশ শিক্ষক বিভাগে আসেন না; শিক্ষার্থীরা এসে অপেক্ষা করতে থাকেন। কখনও কখনও ক্লাসের নির্ধারিত সময়ের আধাঘণ্টা পার হয়ে যাওয়ার পর শিক্ষক জানিয়ে দেন– 'আজ ক্লাস হবে না!' যেন শিক্ষার্থীদের সময়ের কোনোই মূল্য নেই! আবার শিক্ষকদের একটা অংশের পাঠদানের দক্ষতা নিয়েও রয়েছে গুরুতর অভিযোগ। বিশেষ করে বিগত সাত-আট বছরে যারা নিয়োগ পেয়েছেন, তাদের কারও কারও পাঠদানের দক্ষতা নিয়ে শিক্ষার্থীরা হতাশ। একজন শিক্ষক যখন বছরের পর বছর সব কোর্সেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই লেকচার দেন, তখন শিক্ষার্থীরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্লাসে বসে থাকেন উপস্থিতি নম্বরের জন্য! যখন একজন শিক্ষক একটা কোর্সেই ১৮টা অ্যাসাইনমেন্ট দেন, তখন শিক্ষার্থীরা সকাল-সন্ধ্যা শিক্ষকের সমালোচনায় মুখর থাকবেন এটাই স্বাভাবিক! শিক্ষার্থীরা এসব মুখ বুজে সব সহ্য করে যান। একাডেমিক ক্ষেত্রে এসব অনাচার মাথায় নিয়ে একজন শিক্ষার্থীকে যখন বটতলায় ৩০ টাকার বাসি-পচা খাবার খেয়ে ৫০ টাকা বিল শোধ করতে হয়, হলে গিয়ে গাদাগাদি করে থাকতে হয়, তখনও শিক্ষককেই কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। অসুস্থ হলে ভালো চিকিৎসা নেই, প্রয়োজনে অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায় না। অথচ অ্যাম্বুলেন্সে করে মাদক আনা-নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে কিংবা প্রমোদ ভ্রমণে যাওয়া হচ্ছে! শিক্ষার্থীরা এসব বোঝেন; কিন্তু সব সময় বলতে পারেন না।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদালয়ে প্রতি বছর ভর্তি পরীক্ষায় নিয়ম করে পোষ্য কোটায় অতিরিক্ত নম্বর দিয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের সন্তানদের ভর্তি করানো হয়। যেখানে সাধারণ একজন ভর্তিচ্ছু শতকরা সত্তর ভাগ নম্বর পেয়েও ভর্তির সুযোগ পান না, সেখানে পোষ্যরা ৪০ ভাগ নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারছেন; তাও আবার গ্রেস নম্বর নিয়ে পছন্দের বিভাগে। ২০১১-১২ সেশনে ১২ নম্বর গ্রেস দেওয়া হয়েছিল এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার মেয়েকে ভর্তি করানোর জন্য। তো সাধারণ শিক্ষার্থীরা যখন দেখে এসব কোটায় ভর্তিকৃতদের বিশেষ যত্নের সঙ্গে শিক্ষক হওয়ার জন্য তৈরি করা হচ্ছে, তখন তারা হতাশায় মুখ ফিরিয়ে নেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সেটা একটা সময় ক্ষোভে পরিণত হয়। শিক্ষার্থীদের প্রতি বছর উন্নয়ন ফির নামে মোটা অঙ্কের টাকা বিভাগগুলোতে দিতে হয়। সেটা নিয়ে কোনো আন্দোলন-আপত্তি আমলেই নেওয়া হয় না। অন্যদিকে, ভর্তি ফরম বিক্রি বাবদ কয়েক কোটি টাকা প্রতিবছর শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে প্রায় সাড়ে ছয়শ' শিক্ষকের প্রত্যেকেই পেয়েছেন প্রায় এক লাখ ১০ হাজার টাকা করে! এভাবে সাধারণ মানুষের টাকা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষকদের পকেটে যায় না।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন মোট নয়টি বিভাগে সান্ধ্যকালীন কোর্সের নামে প্রাইভেট মাস্টার্স কোর্স চলছে। শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি করা হয়েছে মূলত এসব কোর্স নির্বিঘ্ন করার জন্য। নয়টি কোর্সের কোনোটিতেই কিন্তু একদিনেরও সেশনজট নেই। অন্যদিকে, দু-একটি ছাড়া নিয়মিত কোর্সে প্রত্যেক বিভাগের প্রত্যেক বর্ষে এখন ছয় মাস থেকে এক বছরেরও বেশি সেশনজট চলছে। সেটা দিনে দিনে আরও তীব্র হচ্ছে। এমনও হয়েছে যে, নিয়মিত কোর্সের শিক্ষার্থীদের ক্লাস থেকে বের করে দিয়ে প্রাইভেট কোর্সের ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। এসব বিশেষ কোর্সের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের যতটুকু বিশেষ যত্ন, ঠিক ততটুকুই অবহেলা নিয়মিত কোর্সগুলোর ক্ষেত্রে! এর বাইরে আছে উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নের নামে বিলাসী প্রজেক্ট। এতে কিছু বিভাগে টাইলস-এসি লাগছে, দু-একটি সেমিনার হচ্ছে; কিন্তু শিক্ষার মান কতটুকু উন্নত হচ্ছে, সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ।

সড়ক দুর্ঘটনায় জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুর পর আন্দোলনে সহপাঠীরা

এতকিছুর পরও কথা হতো না, যদি শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষককে স্বপ্নের সেই আদর্শ শিক্ষক হিসেবে পেতেন! একজন শিক্ষককে দেখে, তার কথা বলা, চলাফেরা, ব্যক্তিত্ব দেখে শিক্ষার্থীরা কোনো পথনির্দেশ খুঁজে পায় না। জাহাঙ্গীরনগরে ২০১২ সাল থেকে দু'জন উপাচার্য আন্দোলনের মুখে বিদায় নিয়েছেন। আন্দোলন করেছেন শিক্ষকরাই। সেসব আন্দোলনের ভাষা, ধরন ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা কাছে থেকেই দেখেছেন। যে শিক্ষক অন্যায়ের প্রতিবাদের কথা বলে আন্দোলন করলেন, সেই তিনিই আবার ক্ষমতা পেয়ে একই অন্যায় করছেন! শিক্ষার্থীরা এসব দেখছেন। কিছু কিছু শিক্ষক এতটাই যোগ্য যে, তিনি একাই পাঁচটি পদ ধরে আছেন; তার ক্লাস নেওয়ার সময় কই? 'তার তো অনেক দায়িত্ব!' তাই শিক্ষার্থীদের তিনি বলেন, নিজেরা পড়ে নিও, আমার মিটিং আছে!

এভাবে জমা হতে থাকা ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয়, যখন শিক্ষার্থীরা দেখেন সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত তার সহাপাঠীর জানাজা ক্যাম্পাসে করতে দেওয়া হয় না। অথচ এই সড়কে গতিনিরোধক বসানোর দাবি ছিল অনেক দিনের। প্রতিবাদ করতে গিয়ে যখন সাধারণ শিক্ষার্থীরা দেখেন ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নেতারা তাদের নিবৃত্ত করতে হুমকি-ধমকি দেন, তখন সেটা আর কাজ করে না। উপাচার্য এসেও আর থামাতে পারেন না। এই যে আস্থার সংকট, সেটা তো ওই মহান শিক্ষকরাই তৈরি করেছেন! যে হারে অযোগ্যদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, তাতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরুদণ্ডই ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। কোটা সুবিধা অনেক হয়েছে! এবার থামুন। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট একজন শিক্ষককে দায়িত্ব দিয়েছে 'শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশকে বৈশ্বিক পর্যায়ে উন্নীত করার, শিক্ষার্থীর ছোট-বড়, ব্যক্তিগত-সামষ্টিক সব সমস্যার খোঁজ রাখার!' এই যে কত মহান দায়িত্ব, সেটা ক'জন শিক্ষক বোঝেন, মানেন বা পালন করেন?

সর্বশেষ যে আন্দোলন সেখানে শিক্ষার্থীদের আবেগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, বরং মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। প্রক্টর এবং পুলিশ শিক্ষার্থীদের বলেছেন, 'অভিভাবকরা চান না ক্যাম্পাসে লাশ নিতে!' কী নির্লজ্জ মিথ্যাচার! শিক্ষার্থীরা যখন নিজেরা সচক্ষে এসব দেখেন, তারা শিক্ষকদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলবেন এটাই স্বাভাবিক। নানা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে এটা স্পষ্ট যে, চলমান সংকটকে শিক্ষকদের মধ্য থেকেই উস্কে দেওয়া হচ্ছে! শুধু এ ক্ষেত্রেই নয়। যেসব শিক্ষক প্রায়ই নানা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি হন, তাদের দ্বিমুখী নীতি, দুর্ব্যবহার শিক্ষার্থীদের কাছে সেই গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করেছে অনেক আগেই।

ভাষাসংগ্রামী জাকারিয়া চৌধুরী একবার জাবি ক্যাম্পাসে এসে বলেছিলেন, 'শিক্ষকদের আবার কিসের রাজনীতি?' এক সাংবাদিক বলেছিলেন, 'আমরা ছাত্রাবস্থায় উপাচার্যকে সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান দিতাম। এখন উপাচার্যরা মন্ত্রীর পেছনে ঘোরেন!' সংকটটা এখানেই। তাহলে এত এত সংকটের মাঝে কি ভালো শিক্ষক নেই? অবশ্যই আছেন। কিন্তু ভোটের রাজনীতি তাদের মুখে তালা লাগিয়েছে। তারা দেখেন, শোনেন এবং বোঝেন; কিন্তু কিছু বলেন না। কারণ, সামনের সিন্ডিকেট, সিনেট বা ডিন নির্বাচনে ভোট পেতে হবে! কী নিদারুণ দৈন্যতাই না শিক্ষকদের! এই রাজনীতি যতদিন না বন্ধ হবে, ততদিন শিক্ষার্থীদের এ ধরনের আন্দোলনেও শিক্ষকরাই ফায়দা লুটবেন। সর্বশেষ এই আন্দোলন এত জটিল করার পেছনে অনেক শিক্ষকের হাত আছে বলে শোনা যাচ্ছে। সুতরাং দায়ী কে? শিক্ষার্থীরা অমানবিক নয়। তাদের মনের ভাষাটাকে, আবেগটাকে গুরুত্ব দিন। পদ-পদবি লাভের রাজনীতি বন্ধ করুন। এইবার [illegible] ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদেরই এগিয়ে আসতে হবে। নতুবা ভবিষ্যৎ অন্ধকার!

পরিচালকের দপ্তর
স্মারক নং.........
তারিখ.........
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর